



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 675 - 682

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

দণ্ডীর গুণবাদ : বাংলা কবিতায় প্রয়োগ-সম্ভাবনা

অঙ্কনা বেতাল

সহকারী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Email ID: ankbet2014@gmail.com

 0009-0002-7412-7576

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Schools of
Poetics,
Alamkara, Guna,
Dosa, Riti,
Marga,
Vaidarbhi,
Gaudi.

Abstract

Indian poetics is an ancient and technical discipline. It probably began to develop in first few centuries of the Christian era. Indian poetics or aesthetics features several schools of thoughts focusing 'Kavyatma' or the soul essence of poetry. The most prominent schools are— Rasa (Aesthetic pleasure), Alamkara (Figures of speech), Riti (Style/ Manner), Guna (Qualities/ Attributes), Dhvani (Suggestion), Vakrokti (Obliquity), Auchitya (Propriety). In the tradition Guna (Qualities/ Attributes) was a significant idea. The concept of poetic qualities (Guna) was briefly mentioned in Bharata Muni's 'Natyashastra', the first available text on Indian poetics. Almost six hundred years later Acharya Dandin discussed these qualities (Guna) in detail in his 'Kavyadarsha' around the seventh century. According to him, poetry consists of words conveying the desired meaning, the arrangement of these words constitutes the style (Marga), and the characteristics of this arrangement are the qualities (Guna). In other words, qualities are the fundamental cause of poetic excellence. A literary composition to be considered as poetry, it must avoid flaws (Dosa) and incorporate these qualities (Guna). In his 'Kavyadarsha', Dandin mentioned ten qualities and ten corresponding flaws. These ten qualities are namely: Slesha, Prasada, Samata, Madhurya, Sukumarata, Arthavyakti, Udarata, Ojas, Kanti, and Samadhi. In 'Kavyadarsha', Dandin attempted to explain these qualities (Guna) with the help of various examples from Sanskrit literature. This essay will attempt to examine whether Dandin's concept of qualities (Guna) remains relevant in the context of contemporary Bengali poetry, nearly fifteen hundred years later.

Discussion

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এর সূচনা কবে থেকে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না। বৈদিক যুগ থেকে খ্রিস্টাব্দের সূচনা পর্যন্ত কাব্যতত্ত্ব তথা অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় কাব্য রচয়িতাগণের অজানা ছিল না কিন্তু এই সময়ের কোনো তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের গ্রন্থ হিসেবে তাই আমাদের ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও ভামহ, দণ্ডীর গ্রন্থগুলিকে ধরতে হবে যদিও 'নাট্যশাস্ত্র'-এর সঙ্গে 'কাব্যলংকার' এবং 'কাব্যাদর্শ'-এর কালগত ব্যবধান অন্তত ছয়-সাতশো বছরের। এর মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাসও খণ্ডিত। ভারত থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত প্রায় দুই সহস্রাব্দের ভারতীয় কাব্যবিদ্যার

একটি সুস্থিত পরিক্রমাপথ আছে, কাব্যের সারবস্তু সন্ধান আলংকারিকগণ দীর্ঘ দার্শনিক ও যৌক্তিক প্রতর্ক উপস্থাপিত করেছিলেন। কাব্যের সারবস্তু তথা ‘কাব্যের আত্মা’ নিরূপণের নিমিত্তই বিভিন্ন প্রস্থান বা মতবাদ গড়ে ওঠে যদিও এককালে প্রস্থানভেদ এতখানি প্রকট ছিল না। রস, অলংকার, গুণ, রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি এবং ঔচিত্য— ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রস্থানগুলি সবই খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল, তবে কোনটির ধারণা কত প্রাচীন বলা সম্ভব নয়। যেমন দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শ’-এ যে গুণের আলোচনা করা হয়েছে সেই গুণপ্রস্থান দণ্ডীর একার কীর্তি নয়, ভারতের নাট্যশাস্ত্রেও গুণের ধারণা ছিল এবং অন্যান্য কাব্যতত্ত্ববিদগণ অনেকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গুণকে বিবেচনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে গুণবাদ, রীতিবাদ আর বক্রোক্তিবাদের ঘনিষ্ঠ নৈকট্য রয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে, রীতি হল পদরচনার বা পদসংঘটনার (particular arrangements of words) বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে কতকগুলি কাব্যগুণের ওপর এবং রীতি অঞ্চলভেদে বদলে যায়। এই হল গুণবাদ এবং রীতিবাদের মূল কথা। আর অঞ্চলভিত্তিক রীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত রীতির ধারণায় ঝোঁক দিয়ে কুস্তক হয়ে উঠলেন বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা। এই নিবন্ধে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শ’ অবলম্বনে গুণের ধারণাটি আজকের দিনের কাব্যবিচারে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা মূল্যায়ন করা।

কাব্যে গুণের বোধ অতি প্রাচীন। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের প্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থ ‘নাট্যশাস্ত্র’-এর ‘বাগভিনয়’ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ে নাটকের ভাষারচিত অংশ সম্পর্কে আলোচনায় ভারত দশটি গুণের কথা বলেছিলেন—

“শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধিমাধুর্যমোজঃ পদসৌকুমার্যম্।

অর্থস্য চ ব্যক্তিরূদারতা চ কান্তিষ্চ কাব্যস্য গুণা দশৈতে।।”^১

এখানে কাব্যের যে দশটি গুণের কথা বলা হয়েছে সেগুলির নাম যথাক্রমে— শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজঃ, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা, কান্তি। পরবর্তীকালে ভামহ, দণ্ডী, বামন, ভোজ, মম্বটভট্ট, বিশ্বনাথ কবিরাজ, জগন্নাথ প্রমুখ প্রায় সকল অলংকারবিদই গুণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ভামহ তাঁর ‘কাব্যালংকার’ গ্রন্থে মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ তিনটি গুণের কথা বলেছেন। দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শ’-এ ভারতের উল্লিখিত দশটি গুণের কথা পাওয়া যায় কিন্তু তাদের ক্রম ও বিবরণ স্বতন্ত্র। দণ্ডী কথিত দশটি গুণ বামন বিবৃত করেছেন কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটিকে অর্থগুণ ও শব্দগুণ দ্বিবিধ ভেদ করে মোট কুড়িটি গুণের কথা বলেছেন। অগ্নিপু্রাণে গুণের ভেদ পৃথক ধরনের। ভোজের ‘শৃঙ্গরপ্রকাশ’-এ শব্দগুণ ও অর্থগুণ ২৪ প্রকার এবং তাদের কয়েকটির নাম অভিন্ন হলেও লক্ষণ ভিন্ন। বিশ্বনাথ কবিরাজ ‘সাহিত্যদর্পণ’-এ গুণ সম্পর্কে বলেছেন— ‘রসস্যাঙ্গিত্বমাগুস্য ধর্ম্যঃ শৌর্যাদয়ো যথা।/ গুণাঃ।।’^২ তিনি তিন প্রকারের গুণ নির্দেশ করেছেন, যথা— মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ। তাঁর মতে প্রাচীন আলংকারিকগণ কথিত শ্লেষ, সমাধি, উদার্য ও প্রসাদ গুণ আসলে ওজোগুণেরই অন্তর্গত।

গুণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন আচার্য দণ্ডী ও বামন। বস্তুতপক্ষে তাঁরা অভিন্ন প্রস্থানের দুই পথিক। দণ্ডীর সময়কাল সংশয়মুক্ত নয়। ভামহ ও দণ্ডীর মধ্যে কে পূর্ববর্তী তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভিন্নতা রয়েছে। ভামহ ও দণ্ডীর ভাব ও ভাষা বিশ্লেষণ করে অনেকেই মনে করেন ভামহ পূর্ববর্তী, দণ্ডী তাঁর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুশীলকুমার দে মনে করেন—

“...but so far as a comparative study of their respective text indicates, the presumption is strong in favour of Bhamaha’s priority...”^৩

এবং তাঁর মতে দণ্ডীর আবির্ভাবের ঊর্ধ্বতম সীমা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী। যদিও পণ্ডিতপ্রবর পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে একথা মনে করেন না। তাঁর মতে ভামহ, দণ্ডী প্রায় সমসাময়িক। তাঁদের আবির্ভাব কাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ—

“Whoever may be earlier, both are very near to each other and are to be placed between 650-700 A.D.”^৪

দণ্ডীর পরিচয় সম্পর্কেও বিস্তারিত জানার উপায় নেই। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ রচয়িতার নাম দণ্ডী। ‘দশকুমারচরিত’, ‘অবন্তীসুন্দরীকথা’ ও ‘দ্বিসন্ধানকাব্য’-এর রচয়িতা হিসেবে তিনি খ্যাত। ‘অবন্তীসুন্দরীকথা’-য় প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী নগরের অধিবাসী ছিলেন। এই দণ্ডীই ‘কাব্যাদর্শ’-এর রচয়িতা

দণ্ডী কিনা সে কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।^৫ তবে দণ্ডী ছিলেন বৈদর্ভী রীতির কবি এবং ‘কাব্যাদর্শ’-তে বৈদর্ভী মার্গের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদন করা হয়েছে।

‘কাব্যাদর্শ’ গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক সপ্তম শতক। গ্রন্থটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং পদ্যশৈলীতে রচিত। প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যলক্ষণ, কাব্যভেদ, মার্গভেদ, ও গুণবিচার আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় যথাক্রমে অলংকার ও কাব্যদোষ। ভামহের ‘কাব্যালংকার’ গ্রন্থের মতোই দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শ’-এ অলংকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। কারণ ভামহ, দণ্ডী কালিদাসের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের কাব্যতত্ত্ববিদ ফলে কালিদাসের বিপুল অলংকারসমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভার তাঁদের সামনে ছিল। তাই অলংকারের গুরুত্ব তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। কাব্যকে কাব্যপদবাচ্য হয়ে উঠতে গেলে গুণাধান ও অলংকার সংযোজনা আবশ্যিক—

“গুণ ও অলংকারের মধ্যে আবার গুণের প্রয়োগ অলংকারের প্রয়োগ অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়। গুণের প্রয়োগ অবশ্য করণীয়, অলংকারের প্রয়োগ কবির ইচ্ছাধীন।”^৬

গুণ কাকে বলে? ভরতের মতে যা দোষের বিপরীত তাই হল গুণ— ‘গুণাবিপৰ্যয়াদেয়াং’^৭ (নাট্যশাস্ত্র ১৭। ৯৪)। অগ্নিপু্রাণে ভরতের মত খণ্ডন করে বলা হয়েছে যা কাব্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাই গুণ। (৩৪৬।২-৩ ক)। ‘ধ্বন্যালোক’, ‘কাব্যপ্রকাশ’ ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনায় ধ্বনি ও রসপ্রধান কাব্যতত্ত্বে গুণ রসের ধর্ম, শব্দ বা অর্থের ধর্ম নয়। অর্থাৎ গুণ বা রীতির যে প্রস্থান আপাতভাবে কাব্যদেহের ব্যাপার, বাহ্যত যা দর্শনবিবিক্ত তা আসলে রসধ্বনিবাদীদের দ্বারা রসানুভূতির পশ্চাৎপট নির্মাণে পর্যবসিত।

দণ্ডীর মতে অভীষ্ট অর্থ সম্বলিত পদসমূহই কাব্য— ‘ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী’ (১। ১০)^৮ ইষ্টার্থ কীভাবে বাক্যকে কাব্য করে তোলে? দোষবর্জন, গুণাধান ও অলংকার যোজনার মাধ্যমে। শব্দার্থসমষ্টিকে কাব্যে পরিণত হতে গেলে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে নিবেদিত হতে হবে; সেই ভঙ্গি বা পদবিন্যাসপ্রণালী হল মার্গ ও পদবিন্যাসপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য হল গুণ। প্রকারান্তরে গুণই হল কাব্যসৌন্দর্যের মূল কারণ। কাব্যে গুণের আধানের আগেও দোষকে বর্জন করতে হবে। দশটি দোষের তিলমাত্রকেও কাব্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। গুণগুলি দোষের বিপরীত নয়, সেগুলি স্বাধীন ধর্ম। তারও পরে যোগ করতে হবে অলংকার। দণ্ডী বলেছেন অলংকার কাব্যশোভাকর ধর্ম আর গুণগুলি মার্গের প্রাণ। দণ্ডী যাকে মার্গ বা বর্তমান বলেছেন তা-ই বামনের ভাষায় হয়ে উঠেছে রীতি। বামন রীতিকে কাব্যের আত্মা বলেছিলেন যদিও তারপরে বামন বলেছেন ‘বিশেষো গুণাত্মা’^৯ (১। ১৮) বামন বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চগলী তিনটি আঞ্চলিক রীতির কথা বলেছিলেন আর দণ্ডী বলেছেন অঞ্চলভেদে দুটি রীতির কথা— বৈদর্ভী এবং গৌড়ী। দণ্ডীর মতে বৈদর্ভী রীতি শ্রেষ্ঠ কারণ এতে দশটি গুণের সুসামঞ্জস্য ঘটেছে। সংক্ষেপে এই হল দণ্ডীর গুণপ্রস্থানের মূল বক্তব্য।

‘কাব্যাদর্শ’-এর প্রথম পরিচ্ছেদে দণ্ডী দশটি গুণের উল্লেখ করেছেন—

‘শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সুকুমারতা।

অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিঃ সমাধয়ঃ।।

ইতি বৈদর্ভীমার্গস্য প্রাণাঃ দশগুণাঃ স্মৃতাঃ।

এষাং বিপর্যয়োঃ প্রায়ো দৃশ্যতে গৌড়বর্ত্তানি।।^{১০} (১। ৪১-৪২)

অর্থাৎ— শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশটি বৈদর্ভী মার্গের প্রাণ। গৌড়ী মার্গে প্রায়ই এদের বিপর্যয় লক্ষ করা যায়।

এখন আমরা দেখব উক্ত নামধেয় দশটি গুণের দ্বারা দণ্ডী কী বোঝাতে চেয়েছিলেন এবং আজকের বাংলা কবিতায় তাঁর কাব্যগুণের ধারণা কতটা প্রাসঙ্গিক।

(১) শ্লেষ : যে-পদবিন্যাসে শৈথিল্য দোষের স্পর্শ নেই সেখানে শ্লেষগুণ বর্তমান। অল্পপ্রাণ বর্ণের (বর্ণের প্রথম- ক, চ, ট, ত, প; তৃতীয়- গ, জ, ড, দ, ব; পঞ্চম- ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং অন্তঃস্থ বর্ণ- য, র, ল, ব) বাহুল্যে হয় শৈথিল্য দোষ।

তাহলে— ‘ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।

মধুকরনিকরকরপ্রিতকোকিলকৃজিতকুঞ্জকুটীরে।^{১১} (১। ২৮)

এটি শিথিল পদবন্ধ। গৌড়ী রীতির কবিরা বৃত্তানুপ্রাস ভালোবাসেন বলে শৈথিল্যযুক্ত পদ লেখেন। দণ্ডীর মতে এরকম না হওয়াই কাঙ্ক্ষিত। দণ্ডী যে উদাহরণটি দিয়েছিলেন তা হল ‘মালতী মালা লোলালিকলিলা’।^{১২}

বাংলা কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

‘তারপর যে-তে যে-তে যে-তে

এক নদীর সঙ্গে দেখা।’^{১৩}

এটি দণ্ডীর মতানুসারে শিথিল পদবন্ধের আওতায় পড়বে। সুতরাং এখানে শ্লেষগুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) **প্রসাদ** : প্রসাদগুণ স্বচ্ছতাবোধক। যে কাব্য শোনা মাত্র অর্থবোধ হয় তাকে আমরা বলি প্রসাদগুণসম্পন্ন। অর্থাৎ যা প্রসিদ্ধ অর্থযুক্ত তা প্রসাদগুণসম্পন্ন। ভারতের মতে ‘শব্দ ও অর্থ অনুক্ত হইয়াও যদি বোধগম্য হয় এবং সম্যগ্ বোধ হেতু অর্থ যদি সুখকর হয় তাহা হইলে তাহা প্রসাদগুণ’।^{১৪} ধ্বনিবাদী ও রসবাদীরাও প্রসাদগুণ স্বীকার করেন। রচনা প্রসাদগুণসম্পন্ন হলে রস মুহূর্তকালের মধ্যে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হবে। দণ্ডীর প্রসাদ গুণ একটি অর্থগত গুণ। দণ্ডী দেখিয়েছেন গৌড়ী মার্গে প্রায়ই এই গুণের বৈপরীত্য ঘটে। আমরা বাংলা কবিতা থেকে একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করব।

‘আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে,

বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।’^{১৫}

রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’-এর এই কবিতায় কোথাও অর্থবোধের জটিলতা নেই। এই ধরনের কবিতাকে বলা যেতে পারে প্রসাদগুণসম্পন্ন।

(৩) **সমতা** : সমতা হল বন্ধের (পদবিন্যাস) অবৈষম্য গুণ। দণ্ডীর মতে বন্ধ তিন প্রকার— মৃদু, স্ফুট ও মধ্যম। মৃদু বর্ণ, স্ফুট বর্ণ ও মিশ্র বর্ণের বিন্যাসের দ্বারা এই তিন প্রকার বন্ধ গঠিত হয়। হ্রস্বস্বরসমূহ এবং দন্ত্যবর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) ও বর্গান্ত (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম)-এর বিন্যাসে মৃদুবন্ধ; দীর্ঘস্বরসমূহ এবং ট, ঠ, ড, ঢ, র, শ, ষ, স, হ, সংযুক্ত দন্ত্যবর্ণগুলির বিন্যাসে স্ফুটবন্ধ এবং অবশিষ্ট বর্ণের বিন্যাসে মধ্যমবন্ধ গঠিত হয়। অর্থাৎ এই গুণটির দ্বারা দণ্ডী বোঝাতে চেয়েছেন বাক্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেন একই বন্ধের তথা একই ধরনের বর্ণের প্রয়োগ হয়। বাংলা কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক—

মৃদুবন্ধের উদাহরণ : ‘নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর’^{১৬}

স্ফুটবন্ধের উদাহরণ : ‘ট ঠ ড ঢ করে গোল
কাঁধে নিয়ে ঢাকঢোল।’^{১৭}

মধ্যমবন্ধের উদাহরণ : ‘সকল লোকের মাঝে ব’সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?’^{১৮}

দণ্ডী সমতার যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা শব্দগত। বামনের মতে অর্থের বৈষম্য দোষের অভাবই অর্থগত সমতা। দণ্ডীর মতে মৃদুবন্ধ বৈদর্ভী মার্গে এবং স্ফুটবন্ধ গৌড়ী মার্গে অধিক লক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে মন্মটভট্ট বলেছেন মার্গভেদে সমতা দোষও হতে পারে।

(৪) **মাধুর্য** : মাধুর্য গুণের কথা ভারত থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেছেন যদিও গুণটির স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ আছে। দণ্ডীর ভাষায় ‘মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।/ যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনৈব মধুব্রতাঃ।’^{১৯} অর্থাৎ রসবিশিষ্ট বাক্য মধুর; বাক্যে ও বর্ণনীয় বস্তুতে রস বর্তমান থাকে যার দ্বারা মধু থেকে মধুকরের ন্যায় ধীমান্ ব্যক্তি (অর্থাৎ সহৃদয়

রসিক পাঠক) আনন্দিত হন। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে উপযুক্ত বর্ণযুক্ত বাক্য ও বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হল ব্যঞ্জক এবং রস ব্যঙ্গ্য। বাক্যের এমন রসব্যঞ্জক অর্থবতাই মাধুর্য গুণ। এখানে গুণ ও রসের প্রভেদও সুস্পষ্ট। গুণ শব্দার্থনিষ্ঠ এবং গুণ রসের ধর্ম। সমাসবিহীন বা অল্প সমাসযুক্ত, মৃদুবর্ণযুক্ত বাক্য প্রযুক্ত হবে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্ত রসের ক্ষেত্রে। আবার দীর্ঘ সমাসযুক্ত ও বিকটবর্ণঘটিত বাক্য লিখিত হবে বীর, রৌদ্র ও বীভৎস রসের ক্ষেত্রে। যেমন—

“অবাস্তুর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলমলো
লিখিও, উহা ফিরে চাহো কিনা।”^{২০}

এখানে সমাসহীন মৃদুবর্ণযুক্ত বাক্যে বিপ্রলম্ব শৃঙ্গাররস ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আবার ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর সপ্তম সর্গ থেকে আহৃত পরবর্তী উদাহরণে বীররস নিষ্পন্ন করার মাধ্যম হিসেবে সমাসবহুল বিকটবর্ণঘটিত শব্দরাজি ব্যবহৃত হয়েছে—

“বাহিরিল হুঙ্কারি অসিলোমা বলী
অশ্বপতি; বিড়ালক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্মদ সমরে!”^{২১}

মাধুর্য গুণ প্রসঙ্গে বৈদভী ও গৌড়ী মার্গের ভেদ প্রদর্শন করতে গিয়ে দণ্ডী দেখিয়েছেন উভয় মার্গে অনুপ্রাসবিশিষ্ট পদসমূহ ব্যঞ্জকরূপে পরিগণিত হয়। বৈদভী মার্গে শ্রুতানুপ্রাস এবং গৌড়ী মার্গে বৃত্তানুপ্রাসের আধিক্য দেখা যায়।

(৫) **সুকুমারতা** : সুকুমারতা বা সৌকুমার্য বলতে বোঝায় ‘অনিষ্ঠুর’ বা অশ্রুতিকটু অক্ষরের বাহুল্য। এখানে ‘অনিষ্ঠুর’ বলতে বোঝানো হয়েছে অল্পপ্রাণ ও বিশেষ বিশেষ মহাপ্রাণ বর্ণ। আমাদের খেয়াল করতে হবে শ্লেষগুণের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সকল অক্ষর কোমল হলে শৈথিল্য দোষ দেখা দেয়। তাহলে এই স্ববিরোধের নিষ্পত্তি কী হবে? অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের সংমিশ্রণে শ্লেষগুণ এবং কোমল ও অকোমল বর্ণের মিশ্রণে সৌকুমার্য গুণ। অল্পপ্রাণ ছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ বর্ণও কোমল হতে পারে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ বর্ণও অকোমল বা পরুষ হতে পারে। এখানেই শ্লেষ আর সুকুমারতার ভেদ। দণ্ডী-কথিত সুকুমারতা শব্দের গুণ। বামন এর সঙ্গে অশ্লীলত্বের অভাব হেতু অপারুণ্যকে অর্থগত সৌকুমার্য বলেছেন। সুকুমারতার উদাহরণ হিসেবে দণ্ডী মাঘের ‘শিশুপালবধ’-এর ষষ্ঠ সর্গের বিংশতিতম শ্লোককে উদ্ধৃত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও এর উদাহরণ অপ্রতুল নয়—

“কাঠ থেকে কাঠে উড়ে যাও
প্রজাপতি, কৌমার্য বাঁচাও?”^{২২}

এখানে শ্রুতিকটু বর্ণের বাহুল্য থাকায় সুকুমারতা বা সৌকুমার্য গুণটির অভাব ঘটেছে। কিন্তু “পাতার মতন মনপবনের নাও/ আমায় তুমি কেমন করে চাও?”^{২৩} — এই উদাহরণে সুকুমারতা বর্তমান।

(৬) **অর্থব্যক্তি** : দণ্ডীর কথায় ‘অর্থস্য অনেয়ত্বম্ অর্থব্যক্তিঃ’। সহজ কথায় অর্থব্যক্তি মানে বাক্যের অর্থ যেখানে কষ্টকল্পিত নয়। যেমন—

“ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?
মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জ্বলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে
বসে থাকি?”^{২৪}

এই পংক্তিমালায় কবির যে অর্থ বিবক্ষিত তার উপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ বোঝার জন্য পাঠককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হচ্ছে না। সুতরাং এখানে অর্থব্যক্তি গুণটি অনুমানযোগ্য। আচার্য ভরত অর্থব্যক্তি গুণ স্বীকার করেছেন কিন্তু পরবর্তীকালের আলংকারিকদের মধ্যে মন্মটভট্ট, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ অর্থব্যক্তিকে স্বতন্ত্র গুণরূপে স্বীকার করেননি।

(৭) **উদারতা** : যে বাক্য উচ্চারিত হলে কোনো উৎকর্ষবান গুণ (ত্যাগ, শৌর্য, বীরত্ব ইত্যাদি) প্রতীত হয় সেখানে উদারতা বর্তমান। এই গুণ দ্বারা কাব্যমার্গ উৎকর্ষ লাভ করে। বামন বলেছেন ‘অগ্রাম্যত্বমুদারতা’ (৩।১। ১২)। উদারতা গুণ উভয় মাগেই আদৃত। প্রদত্ত উদাহরণটি উদারতা গুণের দৃষ্টান্ত— “আমরা শক্তি আমরা বল/ আমরা ছাত্রদল।”^{২৫}

(৮) **ওজঃ** : সমাসের বাহুল্যে ওজোগুণ হয়। এই গুণটিকে প্রায় সকল আলংকারিকই স্বীকার করেছেন। দণ্ডীর মতে ওজোগুণ বৈদভী মার্গে গদ্যের প্রাণ এবং গৌড়ী মার্গের পদ্যে এই গুণটি বহুলপ্রচলিত। অর্থাৎ এই গুণটিকে পদ্যের ক্ষেত্রে খুব জরুরি মনে করেননি দণ্ডী। গৌড়দেশ অর্থাৎ পূর্বদেশীয় কবিরা যে সত্যিই সমাসবাহুল্য পছন্দ করতেন তার প্রমাণ দণ্ডীর প্রায় অর্ধ-সহস্রাব্দ পরবর্তী জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দম্’। আধুনিক বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের তুলনায় সমাসবদ্ধতার প্রবণতা কম বলে ওজোগুণের প্রয়োগ একালের কবিতায় কম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

“দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধাক্ত; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দ্রিরা, —
শরদিন্দুনিভাননা— বৈজয়ন্তধামে।”^{২৬ চ}

(৯) **কান্তি** : কান্তিগুণ হল লোকপ্রসিদ্ধ অর্থে স্থিত থাকা। এই গুণ প্রিয়জনের সঙ্গে সংলাপের ক্ষেত্রে কিংবা বস্তুর বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। লোকপ্রসিদ্ধ অর্থে অতিক্রম করলে শ্রোতার চিত্তে অবিশ্বাসের উদ্বেক হয় বলে চমৎকারের হানি হয়। যেমন, একটি জনপ্রিয় বাংলা গানের দুটি পংক্তি— ‘আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে জাগালো ডাইনোসর’^{২৭} — এক্ষেত্রে লৌকিক অর্থে অমান্য করায় কান্তিগুণের অভাব ঘটেছে এমনটা বলা যায়। কিন্তু—

“ভুলে যেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।”^{২৮}

এই কবিতায় লোকপ্রসিদ্ধিকে লঙ্ঘন না করেই চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। দণ্ডী বলেন গৌড়ীয় কবিরা লোকপ্রসিদ্ধ বর্ণনার পক্ষপাতী নন, তাঁরা বর্ণনাকে অতুল্যতার দ্বারা লোকাভীত করে তুলতে পছন্দ করেন। আমাদের মনে হয় আধুনিক বাংলা কবিতা অনেকাংশেই দণ্ডীর এই বক্তব্যকে খণ্ডন করতে সমর্থ হয়েছে।

(১০) **সমাধি** : সমাধি গুণ অতিশয় চারুত্ব সৃষ্টি করে বলে তা কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই গুণ প্রসঙ্গে বৈদভী ও গৌড়ী মার্গের ভেদ নেই। লোকনিয়মকে পালন করে অপ্রস্তুতের ধর্ম প্রস্তুত আরাপের নাম সমাধি। যেমন—

“যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নিল উতপলদল ভরই।।
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দকুসুম পরকাশ।।”^{২৯}

এখানে লোকপ্রসিদ্ধিকে মান্য করেই চোখের সঙ্গে নীলপদ্মের এবং দাঁতের সঙ্গে কুন্দপুষ্পের তুলনা করা হচ্ছে। তাই এখানে সমাধি গুণ সম্যকভাবে বর্তমান। বাংলা কবিতা থেকে একটি অতি প্রচলিত উদাহরণ এখানে ব্যাখ্যা করার সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না, সেটি হল জীবনানন্দ দাশের সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি— “পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।”^{৩০} প্রস্তুত বা উপমেয় চোখকে অপ্রস্তুত বা উপমান পাখির নীড়ের সঙ্গে তুলনা করা লোকপ্রচলিত ছিল না। সুতরাং ‘কাব্যাদর্শ’ অনুযায়ী এখানে সমাধি গুণের অভাব ঘটেছে। অথচ বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যের অন্যতম অভিজ্ঞান এই কবিতাটি। লোকপ্রসিদ্ধিকে উৎক্রমণই এই উপমাটিকে চিরজীবী করে তুলেছে।

বামন যেমন সব কটি গুণেরই শব্দগত ও অর্থগত প্রভেদ করেছিলেন, দণ্ডীর ক্ষেত্রে প্রভেদ উল্লেখ না থাকলেও কিন্তু কিছু গুণ শব্দের এবং কিছু গুণ অর্থগত। সংজ্ঞা অনুসারে মনে হয় শ্লেষ, সমতা, সুকুমারতা ও ওজঃ শব্দগুণ এবং প্রসাদ, অর্থব্যক্তি, উদারতা, কান্তি ও সমাধি অর্থের গুণ এবং মাধুর্য উভবিধ গুণ। বৈদর্ভী মার্গে দশটি গুণের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস ঘটেছে। গৌড়ীতে শ্লেষ, প্রসাদ, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, কান্তি ইত্যাদি গুণের বিপর্যয় প্রায়ই লক্ষ করা যায়। দণ্ডীর মতে অলংকার কাব্যশোভাকর ধর্ম আর গুণ কাব্যের প্রাণস্বরূপ। কাব্য যেমন গুণকে আশ্রয় করবে তেমনি দোষমুক্ত হবে। দোষগুলি গুণের বিপরীত নয়, তাদের স্বরূপ ভিন্ন। ‘কাব্যাদর্শ’-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে দণ্ডী দোষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দণ্ডী-প্রোক্ত দশটি দোষ হল— অপার্থ, ব্যর্থ, একার্থ, সংশয়, অপক্রম, শব্দহীন, যতিভ্রষ্ট, ভিন্নবৃত্ত, বিসন্ধি এবং দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধী দোষ। এই দোষগুলির বিবরণও কৌতূহলোদ্দীপক এবং এখনকার দিনেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। যেমন— অপার্থ দোষ বলতে বোঝায় যেখানে অনেকগুলি বাক্য রয়েছে, প্রত্যেকটি বাক্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ রয়েছে কিন্তু সমস্ত অনুচ্ছেদটি অর্থহীন। আবার বাক্যের বা প্রবন্ধের প্রথমাংশ ও শেষাংশ পরস্পরবিরোধী হলে ব্যর্থ দোষ হয়। বাক্যে শব্দ ও অর্থকে একটুও পরিবর্তন না করে একাধিকবার প্রয়োগ করলে তাকে বলে একার্থ দোষ। শ্রোতার কাছে নিশ্চয়াত্মক অর্থ প্রকাশ করতে প্রযুক্ত বাক্য যদি সংশয় উৎপাদন করে তখন সেই দোষের নাম সংশয়। অর্থের ক্রমহীনতা দোষের নাম অপক্রম। ব্যাকরণে অসিদ্ধ শব্দপ্রয়োগে শব্দহীন দোষ দেখা দেয়। যতিভ্রষ্ট ও ভিন্নবৃত্ত ছন্দের অসংগতি। সন্ধির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সন্ধি না প্রয়োগ করলে হয় বিসন্ধি দোষ। তবে এটি সংস্কৃত কাব্যে যতখানি প্রাসঙ্গিক বাংলা কবিতায় ততখানি নয়। দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধী দোষ আসলে কবির স্থান-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অসচেতনতার ফল। তবে আধুনিক সাহিত্যে গভীরতর তাৎপর্যে এমন ‘দোষ’ দেখা দিতে পারে। পাঠক-সমালোচককে বিবেচনা করতে হবে তা কবির অজ্ঞতাপ্রসূত না নিহিতার্থে প্রযুক্ত।

দণ্ডীর কথায় স্বভাবত সুন্দর ও অলংকারশোভিত দেহও সামান্য শ্বেতকুষ্ঠের জন্য যেমন কুৎসিত হয়ে থাকে তেমনিই কাব্যদোষ সৌন্দর্যের বিষাতক। ফলে সামান্য দোষও বর্জনীয়। কিন্তু সর্বথা দোষমুক্ত কাব্য জগতে দুর্লভ। তাই ‘সাহিত্যদর্পণ’-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন, দোষ কাব্যের উৎকর্ষের তারতম্য ঘটতে পারে কিন্তু রসাদির স্পষ্ট প্রতীতি হলে দোষের কারণে কাব্যত্বের বিনাশ ঘটে না। সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বর্ণিত দশটি গুণের দ্বারা একালের বাংলা কবিতার আলোচনা যেমন করা সম্ভব, একইভাবে একালের কবিরাজ দশটি দোষ সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দণ্ডীর দোষ-গুণের ধারণা আধুনিক কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করাই যায়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত; *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : নবপ্রভা প্রকাশন, ১৯৯০, পৃ. ১৮৫
২. মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত সম্পাদিত; *সাহিত্যদর্পণঃ*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ পৃ. ৪২৩
৩. De, S.K.; *History of Sanskrit Poetics*, Kolkata: Firma KLM Private Limited, 1988, p. 62
৪. Kane, P.V.; *History of Sanskrit Poetics*, Delhi: Motilal Banarasidas Publishers Pvt. Ltd., 2002, p. 115
৫. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত; *কাব্যাদর্শঃ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃ. xxxiii
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত; *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : নবপ্রভা প্রকাশন, ১৯৯০, পৃ. ১৮৫
৮. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত; *কাব্যাদর্শঃ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫
৯. বসু, অনিলাচন্দ্র সম্পাদিত; *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭, পৃ. ৩৯
১০. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত; *কাব্যাদর্শঃ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫ পৃ. ১০৯-১১০
১১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত; *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*, কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০

১২. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত; *কাব্যাদর্শঃ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫ পৃ. ১১৬
১৩. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ; *কবিতাসংগ্রহ ২*, কলকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭
১৪. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত; *কাব্যাদর্শঃ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃ. ১২১-১২২
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; *সহজ পাঠ*, প্রথম ভাগ, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৫
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৭, পৃ. ৫৯৮
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; *সহজ পাঠ*, প্রথম ভাগ, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১
১৮. দাশ, জীবনানন্দ; *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা : ভারবি, ২০০১, পৃ. ১৯
১৯. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত; *কাব্যাদর্শঃ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫, পৃ. ১৩১
২০. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি; *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪২, পৃ. ৪৮
২১. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত; *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯, পৃ. ৯২
২২. গোস্বামী, জয়; *কবিতাসংগ্রহ ২*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পৃ. ২৫৮
২৩. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি; *পদ্যসমগ্র ২*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০১
২৪. ঘোষ, শঙ্খ; *মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪, পৃ. ৫৫
২৫. ইসলাম, নজরুল; *সঙ্ঘিতা*, কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮
২৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত; *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯, পৃ. ৯৪
২৭. চন্দ্রবিন্দু; “গীতগোবিন্দ”, *জুজু*, সোনি মিউজিক, ২০০৩
২৮. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি; *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪২ পৃ. ৪২
২৯. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ সম্পাদিত; *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, ২০১৫, পৃ. ৫৯৬
৩০. দাশ, জীবনানন্দ; *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা : ভারবি, ২০০১, পৃ. ৪৬